# ৪

# মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের ঐতিহ্য পরম্পরা

## পারিবারিক শাসনের পরিচয় ঃ

## ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা

# মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের ঐতিহ্য পরম্পরা
# পারিবারিক শাসনের পরিচয় ঃ
# ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইংরেজদের করদ রাজ্য কোচবিহারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং কুসংস্কার-মুক্ত আধুনিকতা মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালেই লক্ষ্য করা যায় একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে এই উন্নতির মূলে তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের অবদান কিছুই নেই একথা সত্য নয়। একটি রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং কুসংস্কার-মুক্ত আধুনিকতা বলতে বোঝায়, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির সম্মিলিত উন্নতরূপ ও তৎসহ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কোচবিহার রাজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কোচবিহার রাজ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয়েছিল কিন্তু পাশাপাশি দেশীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং শিক্ষার উন্নতি করে কোচবিহার রাজ্যকে একটি বিশেষ মর্যাদাদানে সক্ষম হয়েছিল এই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হ'ল কীভাবে কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিক চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং তার কতটা প্রতিফলন ঘটেছিল সামাজিক, সাহিত্যিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তা পর্যবেক্ষণ করা।

কোচবিহার রাজ্য পূর্বোত্তর ভারতের প্রান্তিক অঞ্চল। প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বলে এই ভৌগোলিক স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপ অঞ্চলকে চারটি অংশে বা পীঠে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বসীমা থেকে এই অংশগুলি হ'ল যথাক্রমে সৌমার পীঠ, কামপীঠ, রত্নপীঠ এবং স্বর্ণপীঠ। বর্তমান কোচবিহার জেলা প্রাচীন কামরূপের রত্নপীঠ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, " দীর্ঘদিন এই অঞ্চলকে 'বেহার' বলা হতো। পরে কোচবিহার হয়েছে।"

মহারাজা বিশ্বসিংহ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরেরাই কোচবিহার রাজ্যে রাজত্ব করেছেন। মহারাজা বিশ্বসিংহ বহুগুণের অধিকার ছিলেন। কোচবিহার রাজ্যের উন্নতিকল্পে মহারাজার সেইসব গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে কোচবিহার রাজ্যে তাঁদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি স্বীয়পুত্র নর নারায়ণ ও শুক্লধ্বজকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বারাণসীতে পাঠিয়েছিলেন। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, রাজ্যপরিচালন কৌশল ও ধর্মনীতি তিনি নিজেই পুত্রদের শেখান। বিশ্বসিংহ নিজের বাহু বলে, সাহসে ও বীরত্বে এক বিশাল অধীশ্বর হয়েছিলেন।

বিশ্বসিংহের পর কোচবিহারের রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন মহারাজা নর নারায়ণ। তিনিই স্বাধীন রাজ্য কোচবিহারের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ স্বরূপ মুদ্রার প্রচলন করলেন যা 'নারায়ণী মুদ্রা' নামে পরিচিত। এর ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে অনেক রাজ্যেই এই মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। র‍্যালফ্ ফিচের বিবরণ থেকে জানা যায় মহারাজা নর নারায়ণের রাজত্বকালে ব্রহ্মপুত্র নদের জলপথে বাংলার নানা স্থানের সহিত কোচবিহার রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই অঞ্চলে মৃগনাভি, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হ'ত। স্থলপথে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য মহারাজা নিজে মাতৃভাষা বাংলায় পুরাণ ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। মহারাজার আগ্রহে সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাবাগীশ) 'প্রয়োগ রত্নমালা' নামে এক সহজবোধ্য সংস্কৃত ব্যকরণ রচনা করেন। পণ্ডিত প্রবর ব্যাকরণের উপক্রমণিকায় লিখেছেন যে শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করবার উদ্দেশ্যে এই ব্যাকরণ রচনা করা হয়। মহারাজার সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল। মহারাজা নর নারায়ণ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তার মাধ্যমে এবং সংস্কৃত ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতদের অবস্থানের মাধ্যমে মহারাজা নর নারায়ণের রাজসভা তদানীন্তনকালে আধুনিকতার আলোকে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

বিশ্বসিংহ ও নর নারায়ণের রাজত্বকালে যে কোচবিহার রাজ্য শিক্ষা ও শাসনে উন্নতির শিখরে উঠেছিল লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বকালে তাতে সামান্য ভাঁটা পড়েছিল। মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করতেন। তিনি নিজে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন না যার ফলে সৈন্যরা যুদ্ধে পরাজিত হতে লাগল। "রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বকালেই দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে 'প্রতিশ্রুত বদ্ধতার' মাধ্যমে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয়েছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা উঠে গিয়ে নারায়ণী আধুলী (অর্দ্ধমুদ্রা) প্রচলিত হয়েছিল।"[১]

লক্ষ্মী নারায়ণের পর কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার যার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল তিনিই মহারাজা বীর নারায়ণ। মহারাজা বীর নারায়ণের মধ্যে দ্বিবিধ গুণের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে তিনি ছিলেন বিলাসপরায়ন অপরদিকে তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। "তিনি কোচবিহার রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে রাজকুমার, ব্রাহ্মণ পুত্র এবং রাজকর্মচারী পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে পরবর্তী মহারাজা প্রাণ নারায়ণের সর্বগুণে গুণান্বিত সম্রাটে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।"[২]

মহারাজা প্রাণ নারায়ণ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কোচবিহারে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হয়। "কবিরত্ন এবং কবিভূষণ নামে দুজন পণ্ডিত মহারাজের 'পঞ্চরত্ন' সভার অধ্যক্ষতা করতেন। মহারাজার সভাসদবর্গ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা নিজে শাস্ত্রালোচনায় দিন যাপন করতেন। তাঁর রাজসভায় গায়কদিগেরও বিশেষ সমাদর ছিল। মহারাজা প্রাণ নারায়ণ জ্ঞানিগুণী ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতেন।"[৩]

স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের ক্ষেত্রে মোদ নারায়ণের রাজত্বকাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহারাজা মোদ নারায়ণ ছিলেন নিঃসন্তান সেইজন্য তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বসিংহের বংশের লোপ পায়। কোচবিহার রাজপরিবারে 'রাজসিংহাসন' নিয়ে শুরু হয়ে যায় অন্তঃকলহ। এই অন্তঃকলহের হিংসাত্মক ছোঁয়ার পরশ লাগে পরবর্তী রাজাদের উপর এবং কোচবিহার রাজ্যের উপর। এরই ফলে কোচবিহার রাজ্যের উন্নতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেইজন্য মোদ নারায়ণের পরবর্তী রাজাদের যেমন বসুদেব নারায়ণ, মহেন্দ্র নারায়ণ, রূপ নারায়ণ, উপেন্দ্র নারায়ণ, দেবেন্দ্র নারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ (প্রথমবার) ও রাজেন্দ্র নারায়ণের সময়ে কোচবিহার রাজ্যের উন্নতি অনেকটা স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল।

কোচবিহার রাজ্যের 'রাজসিংহাসন' নিয়ে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অশান্তির চূড়ান্ত কুফল পরিলক্ষিত হয় রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে। "কোচবিহার রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অশান্তি দূর করবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তথা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে কোচবিহারের মহারাজার ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল এক সন্ধিপ্রস্তাব সাক্ষরিত হয়।"[৪] উক্ত সন্ধির চুক্তি অনুসারে কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব কিছুটা খর্ব হয়ে কোচবিহার একটি করদ রাজ্যে পর্যবসিত হয়েছিল কিন্তু পাশাপাশি একথা স্বীকার করতেই হয় যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তক্ষেপের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের মাধ্যমে কোচবিহারের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল।

ধরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারের রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ (দ্বিতীয়বার)। "কোচবিহারে তখন দাস প্রথা প্রবর্তিত ছিল। কোচবিহার রাজ্যে সমস্ত রকম বিচার একটিমাত্র বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হ'ত। জনসাধারণের মামলার জন্য কোন ব্যয় হ'ত না। সেই সময় কোচবিহার রাজ্যে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হ'ত না।"[৫]

বিভিন্নপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারের রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন স্বর্গীয় মহারাজার শিশুপুত্র হরেন্দ্র নারায়ণ। "নাবালক রাজার রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার করদ রাজ্য কোচবিহারে পর পর কয়েকজন ইংরেজ কমিশনারকে নিযুক্ত করেন। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে গুড্‌লেড, পীটর মুর, হেনরি, ডগলাস এবং স্মিথ প্রভৃতি।"[৬] ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে রাজ্যের শাসনকার্য্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ কমিশনারগণ রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য শাসকে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি কারণ রাজা স্বাধীনতা পেয়েই কু-ক্রিয়াশক্ত হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বুকানন বলেন যে

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ সর্বদা মাদক দ্রব্য সেবন করতেন এবং অসংসর্গেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করতেন, রাজকার্যের প্রতি কিঞ্চিত মাত্র মনযোগ দিতেন না। "মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে বাঙ্গালিবাবুদের আগমন ঘটে করদরাজ্য কোচবিহারে এবং তাঁরাই প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর পদ অলংকৃত করেন।"[৭] কোচবিহারে শুরু হয়ে যায় মিশ্র সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর পারসী, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ছিল প্রখর। তিনি চিত্রশিল্পী ও সংগীত পটু ছিলেন। মহারাজার বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগীত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্যে দীর্ঘদিনের হিংসাত্মক হাওয়ার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেন আনন্দের হাওয়া বইতে থাকে।

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন একজন অসীম গুণের অধিকারী। তাঁর পূর্ববর্তী কোচবিহারের কোন রাজাই তাঁর মতো এমন সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে পারে নি। তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী ও সুশৃঙ্খলাস্থাপক নৃপতি। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদানের মাধ্যমে রাজস্ব থেকে পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণে আয় করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি প্রচুর পিতৃঋণ পরিশোধ করেও সম্পত্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন। "মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে পূর্বপুরুষদের মতো কোন চারিত্রিক দোষ ছিল না। তিনি প্রজাদের কল্যাণার্থে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মশালা' নামে একটি অতিথিশালা স্থাপন করেছিলেন।"[৮]

"রাজ্যের শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসভা ও মহাবিচারালয় স্থাপন করেন। উক্ত বিচারালয়ে রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মামলার চরম নিষ্পত্তি হ'ত। কঠিন বিচারের নিষ্পত্তি স্বয়ং রাজা নিজেই করতেন।"[৯]

মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের দেহত্যাগের পর মাত্র ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন। তদানীন্তন দেওয়ান কালিচন্দ্র লাহিড়ীর উদ্যোগ এবং গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট জেঙ্কিস সাহেবের সহযোগিতায় তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ-ই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা। নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময় আধুনিকতার যে বীজ মহীরূহে পরিণত হয়েছিল তা উপ্ত হয়েছিল নরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে। "তিনি কোচবিহার থেকে ঘৃণ্যতম 'দাসপ্রথা' উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্বে কোচবিহার রাজ্যে 'ষ্টাম্প' প্রচলিত ছিল না, মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ-ই ষ্টাম্প সম্বন্ধীয় নিয়ম এদেশে প্রচার করেন। কোচবিহাররের দীর্ঘদিনের শত্রু ভূটিয়াদিগের প্রতিরোধ করতে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ সক্ষম হয়েছিলেন।"[১০] এরপর মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ। সে প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচরাজত্বের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে কৃষির উপর। অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে করদরাজ্য কোচবিহারে কৃষক ও কৃষিব্যবস্থায়ও আধুনিকতার দুর্লভ পরশ লেগেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় অপরদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

কোচবিহার রাজ্যের পথসংযোগ, মন্দির ও শিবলিঙ্গের প্রাচীনত্ব ও দুয়ার অঞ্চলের গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, এখানে অনেকদিন আগে জনবসতি বিস্তার লাভ করেছে। এই জনবসতি গৌড়বঙ্গের পালযুগ বা সেন যুগের মতো স্থিতিশীল ছিল না। ভাগ্যান্বেষী কৃষক সম্প্রদায় এসে এই অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সমাজের যে স্তরের বাসিন্দা এরা সে স্তরে সামাজিক অনুশাসন ও বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিল না। সমাজ বা গ্রাম কিছুই স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে নি। এই বাসিন্দাদের সাথে পার্বত্যাঞ্চলের বাসিন্দাদের সংযোগ ছিল, সে সংযোগ কেবলমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হয়। এই সমাজের সাংস্কৃতিক আচরণও পারিবারিক জীবনের মত উদার ও সীমাবদ্ধ ছিল। "ধর্মবিশ্বাস কেবলমাত্র প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায়।"[১১]

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রয়োজনের তাগিদে আদিম মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে। শিকার জীবন থেকে মহাকাশের যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, যদিও ধর্মসম্পর্কিত ব্যাখ্যায় নানা সম্প্রদায় ও নানা দেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেবীপূজার প্রাধান্য দেখা যায় আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হলে

দেবপূজার প্রাধান্য দেখা যায়। কোচবিহার রাজ্যে একদিকে দেবীপূজা অপরদিকে দেবতা পূজার প্রচলন দেখা যায়।

কোচবিহারের প্রচলিত সম্প্রদায় বৃক্ষ (বট, বাঁশ, শ্যাওড়া) পূজা করে থাকে। অন্যদিকে 'য্যাল পূজার' প্রচলনও দেখা যায়। মনে হয় কোন প্রেত বা অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে দেওয়াই এই পূজার উদ্দেশ্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোচবিহার সমাজে ঝাড়, ফুঁক ও মাদুলী ইত্যাদির প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সর্পঘাতের ভয়ে 'মনসা' বা বিষহরি' পূজার প্রচলনও কোচবিহার সমাজে ছিল। সুতরাং ভয় নামক 'আর্জ' (Urge) থেকেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার প্রচলন যে ঘটে সেই নমুনা কোচবিহার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কাজ করেছে। ভয়, বিশ্বাস ইত্যাদি ছাড়াও রাজরাজাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে রাজরাজাদের বিশেষ দেবদেবীর বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আবার কোচবিহারে বিশেষ করে নর নারায়ণের সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে মূল দুই দেবতা শিব ও বিষ্ণুর পূজা কোচবিহারে রয়েছে। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও কোচবিহারে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহার রাজ্যের পাশেই নেপাল ও ভূটান রাজ্য এবং এই রাজ্যগুলির বেশীরভাগ জনসাধারণ-ই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সেইজন্য স্বাভাবিক কারণেই কোচবিহার রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়েছে। তদানীন্তন সেটল্‌মেন্ট নায়েব আহেলকর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তাঁর "CoochBehar states and its Land Revenu Settlement" গ্রন্থখানিতে বলেছেন, " There are two main sects among the Hindus, the Vaishnavas and the Saktas. Among the vaishnavas there are two defined sects, known as Sankara Panthis and Damodara Panthis. The worship of God Shiva is very popular. There are temples of Siva all over the country, all maintained by the state ; here the people offer pujas and presents all round the year.

The musalmans are mostly of the Shia Sects ; they offer presents to Pirs and have Dargas. "

সুতরাং বলা যায় কোচবিহার রাজ্যটি ছিল সকল ধর্ম সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। বলা যায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজ্য। বুকানন হ্যামিল্টন বা হান্টার কোচবিহার রাজ্য পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে কোচবিহার সমাজে অনুভূমিক পরিবর্তন সামান্য হলেও উল্লম্ব পরিবর্তন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ, অভ্যন্তরীণ কলহ, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী পরামর্শদাতার কুটীল ভূমিকা ও প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ লেগেই ছিল। সামাজিক দিক থেকে এই অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। ঘনঘন গৃহবিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ কৃষককুলকে অনিশ্চিত, অরক্ষিত ও আতঙ্কিত করে রেখেছিল। যার ফলে কোচবিহার রাজ্যে কৃষিকর্ম বেশী প্রসার লাভ করেনি। উত্তর-পশ্চিমাংশে ও উত্তরাংশে আদিম অরণ্য ও বন্য জন্তুর প্রকোপে স্থায়ী কৃষিকাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

"জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলের বসতি গড়ে ওঠে দক্ষিণাঞ্চলে গৌড়বঙ্গের, পূর্বাঞ্চলে আসামের ও উত্তরাঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিদের দ্বারা দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণপূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত কৃষিযোগ্য নদী অববাহিকার সমভূমি। এই প্রান্তিক অঞ্চলে যেভাবে যে শ্রেণীর জনবসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই রয়েছে এই অঞ্চলের গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য।"[১২]

নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে গৌড়বঙ্গ বা অন্যান্য অঞ্চল থেকে কৃষকেরা এসেছে এই অঞ্চলে বাস করতে। জঙ্গল কেটে আবাদী জমি বের করার জন্য মূল কৃষক তাঁর আত্মীয়বর্গকে ডেকে আনে। এরা সকলে একসাথে বাস করে। "প্রধান কৃষক হল কর্তাস্থানীয় এই অঞ্চলে তাকে 'দেওয়ানিয়া' বলা হয়। এই ব্যক্তি একই সাথে জোতদার ও কৃষক কিন্তু এর আত্মীয়বর্গ দুঃস্থ। তারা এর প্রজা বা অধঃস্তন কৃষক বলে গণ্য হয়। সামাজিক মর্যাদায়, আচার ব্যবহারে, ধর্মবিশ্বাসে এবং পারিবারিক সম্পর্কে এরা সবাই সমান, সকলেই কৃষক, সেইজন্য কোন শ্রেণী বিদ্বেষ গড়ে ওঠেনি।"[১৩]

কোচবিহার অঞ্চলের গ্রামে বর্ণবিভাগ বিশেষ ছিল না। হিন্দুরা সকলেই একই বর্ণের ছিল। মুসলমানগণ অধিকাংশই ধর্মান্তরিত কিন্তু এরা কৃষক। গ্রামে অকৃষিজীবি মানুষের অস্তিত্ব প্রায় নাই বললেই হয়। উচ্চবর্ণ বলতে এক-আধঘর ব্রাহ্মণ ছিল ক্রিয়াকর্মের জন্য। এই ব্রাহ্মণ পরিবারও আচার ব্যবহারে সামাজিক স্বীকৃতিতে পূর্ববঙ্গের বা দক্ষিণবঙ্গের ব্রাহ্মণজাতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল।

বর্ণভিত্তিক বৈচিত্র্যের বদলে এখানে স্ববর্ণ সমাজের সাম্যভাব লক্ষ করা যায়। এই জেলার গ্রাম্য সমাজের সাম্প্রদায়িক চিত্রটিও অন্য অঞ্চলের চিত্র থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামে কৃষিজীবি হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়নি। বর্ণগত সাম্যবাদ বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি হতে দেয়নি। পরবর্তীকালে কোচবিহার রাজ্য থেকে এই সাম্যভাব দূর হয়ে মর্যাদার বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সে বৈষম্যের কারণ হল গ্রামের জোতদার শ্রেণীর নাগরিক জীবনের মান ও আচার ব্যবহার গ্রহণ। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ববর্ণের মধ্যেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

গ্রামে বর্ণ হিন্দু অকৃষিজীবির অস্তিত্ব না থাকায় গ্রামীন সমাজে শোষক ও শোষিতের ধারণা বিশেষ গড়ে ওঠেনি। "যতদিন পর্য্যন্ত জোতদার শ্রেণী নাগরিক জীবনের অনুকরণ করেননি বা সামাজিক মান মর্যাদা বৃদ্ধির সোপানস্বরূপ নাগরিক আচার ব্যবহার গ্রহণ এবং গ্রাম ত্যাগ করে শহরে বাস করা আরম্ভ করেনি ততদিন পর্য্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। দু-এক পুরুষ পার হবার পর শিক্ষা, উদ্বৃত্ত আয়, রাজনৈতিক চেতনা ও প্রশাসনিক কাঠামোর প্রভাবে এই পরিবর্তন শুরু হয়।"[১৪]

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব বিশ্লেষণ করলে এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রজাস্বত্ব বন্টন হ'ত মৌখিকভাবে। পাট্টা বা কবুলিয়ৎ প্রথাও প্রথমদিকে চালু ছিল না। যে সরাসরি জমির বন্দোবস্ত করেছে সেই জোতদার। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে এই ব্যবস্থাকে আধুনিক ধাঁচে গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়। এই কারণে যখন ব্রিটিশ শক্তির সাথে চুক্তি হয় ও কর দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন বিস্তৃত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য রাজকর্মচারী প্রেরিত হ'ত — এদের বলা হ'ত 'সাজোয়াল'। 'সাজোয়াল' জোতদারের নিকট থেকে সরাসরি খাজনা ও মফঃস্বল খরচ আদায় করতো। "রাজ অমাত্যবর্গ নিজ অধিকারে যে সব জমি রেখেছিল বা রাজপরিবারে খাস দখলে যে সব জমি ছিল সেসব জমি সর্বত্রই জোতদারকে পত্তন দেয়া হত। 'জোতদারী' ব্যবস্থাই ছিল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।"[১৫] ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ সরকার প্রশাসনিক সংস্কারে উদ্যোগী হল তখন 'সাজোয়াল' প্রথার বিলোপ করে 'ইজারাদারী' প্রথা চালু করা হয়। ইজারাদরগণ বার্ষিক ইজারায় চুক্তি করতো। এই ব্যবস্থার ফলে 'লগনী' প্রথার সৃষ্টি হয়। এই প্রথা অনুসারে প্রকৃত জোতদার নিজস্বত্ব ইজারাদারকে অর্পণ করে নিজে অধস্তন স্বত্বাধিকারী হ'ল। অনুরূপ আরেকটি প্রথা হ'ল 'ভাগিয়ারী' প্রথা। এছাড়া প্রজা হিসাবে কোন কোন কৃষক আখ্যা পেত। প্রজা বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভূমিহীন কৃষক। পরবর্তীকালে প্রজাই আধিয়ার। উপরিবর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কোচবিহারের গ্রামীণ সমাজে বিশেষ বিশেষ কৃষি ভিত্তিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কোচবিহার রাজ্যে কৃষির ক্ষেত্রে এই অনুভূমিক শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও উল্লম্ব শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহারের গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় দেখা যায় জোতদারের অধীনস্থ হল চুকানীদার তারপর যথাক্রমে দর চুকানীদার, দরাদর চুকানীদার, তস্য চুকানীদার, তালী চুকানীদার, তস্যতালী চুকানীদার। তবে উল্লম্ব গতিশীলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে জোতদার শ্রেণীর সামাজিক অগ্রগতি।

কোচবিহার রাজ্যে গ্রামসমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় না। এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হতে সেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যার কারণে এরা মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। এই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ সমাজকে কোচরাজন্যবর্গ কাশী থেকে এনেছিলেন। রাজা নর নারায়ণ, মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এ রাজ্যে এনেছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করে কোচবিহার রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরা মূলত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এদের সঙ্গে নবদ্বীপ বা শ্রীহট্টের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কিছু পার্থক্য আছে। এরা কনৌজী-ব্রাহ্মণ—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ ও পঠনপাঠন এদের কাজ। এরা এই অঞ্চলের হিন্দুসমাজে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন ও জীবনযাত্রার আদর্শ লক্ষ্য করে এক স্মৃতি সংহিতার আদর্শ অনুসরণ না করে নিজস্ব আচার ব্যবহার চালু করেছেন। এর ফলে কোচবিহার রাজ্যে নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর বিধান চালু না হয়ে এক বিশেষ আঞ্চলিক বিধান চালু হয়। এই বিধানগুলি 'কৌমুদী' নামে ১৮খানি গ্রন্থে লেখা আছে। এই কনৌজী ব্রাহ্মণগণ পঠন-পাঠন ও রাজার ধর্মাচরণ প্রভৃতিতে সাহায্য করতেন। রাজধানী সংলগ্ন খাগড়াবাড়ীতে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। গ্রাম সমাজে যে ব্রাহ্মণগণ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার্চনা ও শাস্ত্রাচার রক্ষা করে চলে তারা 'অধিকরী' উপাধিধারী। এরা এই অঞ্চলের বিশেষ ব্রাহ্মণ, অন্য অঞ্চলে এই জাতীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায় না।

এই রাজ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল সেটা সম্পূর্ণই বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের নিয়ে যারা কর্মসূত্রে এই রাজ্যে এসেছিলেন বা কর্মক্ষেত্র হিসাবে এই রাজ্য বেছে নিয়েছিলেন। এদের আগমনের মধ্য দিয়ে নগরজীবন শুরু হয়। সূচনা থেকেই ব্রাহ্মণকে রাজার মন্ত্রী, পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায় ঃ "Of high caste Hindus Brahmans number 6,129 ; Baidyas 238 ; and Kayasthas 2,615. Most of these are, however, foreigners who either hold service under the state, or carry on business in the country. The native population may be roughly taken to contain 2,000 of the Brahmans and 700 of the Kayasthas ; there are no resident Baidyas in the country. They are old settlers from Bengal and Assam who have made CoochBehar their home and have cutoff all connection with their old birth place." [১৬] অকৃষি পেশা বা রাজকর্মে থাকায় এরা শহর অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এদের কোন বসতি ছিল না, যদিও এরা ছোটখাট জোতদারী পেয়ে ভাগচাষে কৃষিকাজ করত। কিন্তু এরা কেউ গ্রামে বাস করেনি। এই বিশেষ অভাব থাকায় কোচবিহার রাজ্যের সমাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র।

গ্রামীণ সমাজে মুসলমানগণ সাধারণতঃ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক ব্যবহার পেত না। "১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,৭৮৮৬৮ জন। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩০% অর্থাৎ ১,৭০,৭৪৬ জন, এদের মধ্যে পাঠান সৈয়দ মাত্র ১,১৪৬ জন, বাকি সকলে শেখ নস্য। এরা অধিকাংশ শিয়া পন্থী। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মেখলীগঞ্জ — হলদিবাড়ী অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৪২% মুসলমান, তারপর দিনহাটা, লালবাজার, সিতাই ৩৩%, তুফানগঞ্জ ২৬%, সদর মহকুমায় ২৪% এবং মাথাভাঙ্গায় ২৩% ।"[১৭] এই মুসলমানদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য না থাকলেও সমাজিক বৈষম্য ছিল। সমাজিক মর্যাদায় পাঠান, মোগল, সৈয়দগণ উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। এদের নিচে হল শেখ নস্য। এই শেষোক্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ধর্মান্তরিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা উন্নতি লাভ করলেও সামাজিক মর্যাদায় পাঠানদের সমকক্ষ হয়নি। পাঠানদের সংখ্যা খুব-ই নগণ্য মাত্র ১,১৪৬ জন এরা সীমাবদ্ধ দিনহাটার সিতাই অঞ্চলে এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমার রহিমগঞ্জ অঞ্চলে। শেখ নস্য অল্প বিস্তর সকল মহকুমায় ছড়িয়ে আছে। শেখ নস্য সম্প্রদায় আচার ব্যবহারে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে হিন্দুসমাজের সঙ্গে কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখায় না। দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। জোতদার শ্রেণীর মধ্যে যখন 'শহুরে' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান অনুসরণ করার প্রেরণা জাগ্রত হয় তখন গ্রাম্য সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজ যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবিকা-ভিত্তিক তা নয়, এই সমাজ বর্ণ-ভিত্তিকও বটে। এই সমাজ 'মর্যাদা' স্থির হয় বর্ণানুসারে, সম্পদ বা অর্থের ভিত্তিতে নয়। সামাজিক বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায় বলে এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আরেকটি বিশেষ আখ্যা দেয়া হয় 'ভদ্রলোক শ্রেণী'। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের অধীনস্থ থাকায় এই শহরবাসী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে অন্য ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এখানকার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর শিরমণি ছিল প্রশাসকগণ। রাজসরকারের বিধি নিষেধ এদের প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। রাজসরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও সমর্থন ছাড়া এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীন উদ্যমকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না। কোচবিহার রাজ্যে কোচরাজবংশের শাসনের ফলে প্রভূত সামাজিক উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতির সুবিধাগুলি শহরাঞ্চলে যত বেশী ভোগ করা যেত গ্রামাঞ্চলে তত ভোগ করা সম্ভব ছিল না।

কোচবিহার রাজ্যে কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে পাঠানো হত তার মধ্যে তামাক, পাট, সঃ তেল এবং ধান প্রধান। আবার নানাবিধ বস্ত্র, লবন, নানাপ্রকারের বাসন, চিনি ও মশলা প্রভৃতি অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বস্তু বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। পরবর্তী সময়ে রেলওয়ে হওয়াতে আগের তুলনায় দ্বিগুণ পাটের রপ্তানি করা হত আবার কাপড়ও অধিক পরিমাণে আমদানী করা হত। বাণিজ্য কার্য্য প্রধানত বিদেশীদের দ্বারাই সম্পন্ন হত। এর মধ্যে যোধপুর, বিকানীর এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাঁইয়া মহাজনই অধিক। রাজধানীতে এদের প্রধান আড্ডা ছিল এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানে তার শাখা-প্রশাখা ছিল। "বাণিজ্য স্থানের মধ্যে কোচবিহার নগরই প্রধান। এদেশের বিক্রয় কার্য্য প্রধানত হাটেই সম্পন্ন হত। দেশীয় সমস্ত লোক নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য কাছাকাছি হাটে এনে বিক্রি করত এবং ছোট ছোট মহাজনেরা কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাঝে মধ্যে হাটে এনে বিক্রি করতো। উপরিউক্ত কারণেই কোচবিহারে হাটের

সংখ্যা অধিক। কোচবিহারের নদীগুলি সারাবছর নাব্য নয় সেই কারণে বাণিজ্য কার্য্যে নৌকার পরিবর্তে গরুরগাড়ী, বলদ ও ঘোড়ার দ্বারাই সম্পাদন করা হ'ত। সাধারণত মুটিয়ার সংখ্যাও অল্প; বেশীরভাগ গৃহস্থরই ঘোড়া ও বলদের গাড়ী থাকতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘোড়া ও বলদের সাহায্যেই বিক্রিত দ্রব্য বাজারে নেওয়া এবং ক্রীতদ্রব্য বাড়িতে আনা হত।"[১৮]

"কোচবিহার রাজ্যে মানুষ কেনা বেচা নিষিদ্ধ ছিল না; লোকে মানুষ কেনা বেচার ব্যবসা করত এবং কেউ কেউ দায়ে পড়ে নিজেকে বন্দক দিত অথবা নিজেকে বিক্রি করত। বালক বালিকাদের সুসজ্জিত করে হাটে বাজারে বিক্রি করা হ'ত।"[১৯] আসাম এবং কোচবিহার থেকে প্রতি বৎসর প্রায় একশ করে বালক বালিকা বিক্রির জন্য বাংলাদেশে পাঠানো হ'ত। নিম্নতর শ্রেণীর বালক বালিকাদের গারোদের কাছে বিক্রি করা হত; কোন কোন সময় তাদেরকে আসামের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত চালান দেওয়া হ'ত। প্রতিবেশী ভোট ও গারো জাতির লোকেরা মোগল অধিকার এবং কোচবিহার রাজ্য হতে চুরি করে অথবা জোর করে ধরে তাদেরকে দাসদাসী করত। নিজ সন্তানকে বিক্রির কথা টার্নারও লিখেছেন, " Nothing is more common than to see a mother dress up her child, and bring to market, with no ather hope, no other view, than to enhance the price she may procure for it." ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্য থেকে এই ঘৃণ্যতম 'দাস প্রথা' অবলুপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কোচবিহার রাজ্যে 'বহুবিবাহ' প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথাও অবলুপ্তির দিকে। কারণ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রজা এবং প্রজাপালক উভয়েরই উল্লিখিত কু-প্রথার কুফল বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

তৃতীয়ত ঃ আধুনিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। কোচবিহার রাজতন্ত্রে প্রথম থেকেই দেখা যায় যে রাজাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম আছে কিন্তু পাশাপাশি অন্যধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় মত প্রকাশ করতে বা প্রতিষ্ঠা করতে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

চতুর্থত ঃ কোচবিহার রাজ্যে 'সতীদাহ' প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু যখন শিক্ষার যুক্তিবাদী আলো কোচবিহার রাজ্যে প্রতিফলিত হ'ল তখন মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সহযোগিতায় আইন করে কোচবিহার রাজ্য থেকে এই কু-প্রথাটি নিষিদ্ধ করা হয়।

বর্তমানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকার্যে সহযোগিতার ফলেই হ'ক অথবা রাজন্যবর্গের উন্নত মানসিকতার জন্যই হ'ক বা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার লাভের জন্যই হ'ক কোচবিহার রাজ্য থেকে উপরে বর্ণিত প্রাচীন কু-প্রথাগুলি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

সংস্কৃতি বলতে বোঝায়, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও শিক্ষার সমষ্টিগতরূপ। কোচবিহারের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। প্রাক ইংরেজ আমলে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলি ছিল দেশের নানা প্রান্তে ছড়ানো। রাজা, জমিদার ও সুলতানদের সুলভ আনুকূল্যে তা বিস্তৃতি লাভ করেছিল সুদূর চট্টগ্রাম রোসাঙের আরাকান রাজসভা বাংলার ত্রিপুরা থেকে কামতা কোচবিহার পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তই এই অবস্থা বর্তমান ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলার সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি মহানগরী কলকাতাকে আশ্রয় করে অনেকখানি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "দুই তিন শতক পূর্বের সাহিত্য সাধনা এরূপ কেন্দ্রীভূত ছিল না, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্থানে এই সাহিত্য সাধনা ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে।"[২০]

যে সমস্ত রাজসভা বাংলার সাহিত্য সাধনর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে তাদের মধ্যে কামতা কোচবিহার অন্যতম। ধারাবাহিক ঐতহাসিক কাহিনী ও আখ্যানকাব্য রচনায় ত্রিপুরা বিশেষ অগ্রণী হলেও এ বিষয়েও কোচবিহারও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারেও রাজবংশাবলী রচিত হয়েছে। আচার্য্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে। পুরাণাদির অনুবাদও সংখ্যার দিক দিয়ে কোচবিহারে বেশী।"[২১]

একথা সত্য যে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ তাঁদের শাসনকালের অধিকাংশ সময়-ই রাজ্যবিস্তার, রাজ্যরক্ষা, প্রাসাদের ভিতরে ও বাইরে অপ্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ দমনেই ব্যস্ত থাকতেন, তথাপি এটাও অনস্বীকার্য যে লোকায়ত ও পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসারও তাঁদের কাম্য ছিল।

কোচবিহার রাজবংশের রাজারা বরাবর বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি যথাসাধ্য আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেরাও সাহিত্য সাধনার দুঃসাধ্যব্রত উদ্‌যাপনে ব্যপৃত থেকেছেন। এমনকি, রাজঅন্তপুরের বিদূষী মহারাণী ও পুরনারীগণও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কোচবিহারের ইতিহাসে এ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কোচরাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ কনৌজ, কাশী ও অন্যান্য স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এ রাজ্যে এনেছিলেন এবং তাঁদেরকে কোচবিহার রাজ্যে স্থাপন করে গেছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব আচার্য্যের পুত্র বল্লভ আচার্য্যকে তিনি শ্রীক্ষেত্র থেকে কোচবিহারে এনেছিলেন এবং তাঁকে কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। শিখ ধর্মের বিবরণে লেখা আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে শিখ ধর্মের আদি গুরু বাবা নানক কামরূপে এসেছিলেন ঃ "Guru Nanak and Mardana went to Kamrup, a country whose women were famous for their skill in incantation and magic. It was governed by a Queen called Nurshah in the Sikh chronicles. She, with her several females, went to the Guru and tried to obtain influence over him. It is said that they became followers of Guru Nanak, and thus secured salvation. The Guru returned from kamrup by the great river Bramhaputra, and than made a coasting voyage to Puri on the Bay of Bengal." [২২]

মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র নর নারায়ণের সময় থেকেই কোচরাজবংশে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। আসাম বিজয়ের পর সুবিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত শ্রী শঙ্করদেব কামতারাজ্যে আগমন করেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কোচবিহার রাজ্যে বাস করেছিলেন। মহারাজা নর নারায়ণের রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সর্বদা সুশোভিত থাকত। তাঁর সময় কোচবিহার রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। ভূষণ দ্বিজ রাজকবি ছিলেন; রাজসভায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হ'ত এবং রাজকার্য্যে মূর্খ কর্মচারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।

সংস্কৃত বিনে আন মাতন মাতয়,
সামান্য কথাকো সবে সংস্কৃত কয়।
(ভূষণ দ্বিজ—মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবন চরিত্র পৃঃ ১৬৮)

মহারাজা নর নারায়ণের রাজত্বকালে পশ্চিম প্রদেশ থেকে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোচবিহার রাজ্যে এসেছিলেন এবং রাজসভার পণ্ডিতগণের সাথে তর্কযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রাজা ও রাজমহিষীর আদেশে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত ব্যকরণ 'প্রয়োগ রত্নমালা' রচনা করেন। গন্ধর্ব্ব নারায়ণের বংশাবলীতে লেখা আছে,

" নৃপতির প্রিয়তমা ভানুপটেশ্বরী।
ভট্টাচার্য্য আগে কথা কহিলা সাদরি ॥
পাণিনির বর্ণক্রম গ্রন্থে নে লিখিবা
মহেশের কৃত কলাপের ক্রম দিবা (২) ॥" ৯৩ পত্র।

পণ্ডিত অনিরুদ্ধ এবং রাম সরস্বতী রাজার আদেশে রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের পদ পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীধর দৈবজ্ঞ 'জ্যোতিষ' নামে নিবন্ধ এবং বকুল কায়স্থ 'ভূমি পরিমাণ' নামে বই রচনা করেছিলেন এবং 'লীলাবতীর' অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি একখানি 'অঙ্কের পুথি' ও রচনা করেছিলেন। কোন এক 'বকুল কায়স্থ' কর্তৃক ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত 'কিতাবৎ মঞ্জরী' নামক (অসমিয়া ভাষায়) একখানি অঙ্কের পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদগুরু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহারাজা নর নারায়ণ তাঁকে রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি 'কৌমুদী' নাম

দিয়ে অনেকগুলি স্মৃতি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় বহু বই-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। রাজার অন্যতম সভাসদ্ অনন্ত কন্দলীও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রী শঙ্করদের মহারাজা নর নারায়ণের আশ্রয়ে থেকে কৃষ্ণনাম প্রচার করতেন। তিনি 'সীতাস্বয়ংবর' নাটক, 'কৃষ্ণগুণমালা' নাটক, শ্রীমদ্ভাগবতের পদ (পদ্যানুবাদ) রচনা করেন। এখান থেকে তিনি তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। কোচ রাজত্বে পুরান চর্চায় ভাগবতের গুরুত্ব ছিল সমাধিক এবং এ অনুবাদে মুখ্য ভূমিকা ছিল সাধক শঙ্করদেবের। সাধক শঙ্করদেব 'একশরন নাম ধর্ম' প্রচার করে জনচিত্ত উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ সাধনায় শ্রীমদ্ভাগবতই ছিল প্রধান অবলম্বন। তাঁর ধারণায়, "পুরাণর মূল ইহাক বুলিয়ইসে বেদান্তের সজ্জা।"[২৩] শঙ্করদেব অনুবাদের বাঁধা পথ থেকে সরে এসে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, যেমন ঃ

শুকমুনি নিগদতি শুনারাজা মহামতি
কহো ভাগবতের লক্ষণ।
পুরষর পায়া দৃষ্টি উপজে কারণ সৃষ্টি
আকে সর্গ বোলে সাধুজন।।
ব্রাহ্ম আদি নানা মত স্রজে চরাচর যত
ইহাকে বিসর্গ বুলি জান।
রাজা দৈব দৈত্যে জাক পাইলে মহামহিমাক
ইটো লক্ষণর নাম স্থান॥[২৪]

সাধক শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি বিষয়কে সহজ ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই জন-অভিমুখতা কোচবিহারের সাহিত্যের সবচেয়ে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবত কাব্য রচনায় সাধক শঙ্করদেবের অহঙ্কারের পরিবর্তে সমাজের কাছে তাঁর বিনীত আবেদন পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ

" হয়া অল্পমতি পদ ভাগবত
রচিল জানি ন জানি।
ক্ষমিয়োক দোষ হুয়োক সন্তোষ
শুনিয়ো কৃষ্ণ কাহিনী।" [২৫]

মহারাজা নর নারায়ণের চেষ্টায় কামরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সেইজন্য তিনি আজও 'কামরূপের বিক্রমাদিত্য' বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। আসামের মানুষেরাও তাই মহারাজা নর নারায়ণকে বলে থাকেন, "নর নারায়ণ রজা বিদ্যোৎসাহী পুরুষ আছিল। তেঁও প্রকৃততে আসামের বিক্রমাদিত্য।"[২৬] মহারাজা নর নারায়ণ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিভিন্ন পুস্তকে তাঁর সঙ্গে আসাম রাজত্বের সুসম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। "... it would not be an exaggeration to say that the whole of the ancient Literature of Assam is full of appreciative reference to the benevolent Koch rulers of the past. It is hoped that the publication of this book will awaken and interest in the minds of our educated young man in the historical literature of our country and will serve also to help in restoring the old happy relations that existed between Cooch Behar and Assam."[২৭]

মহারাজা নর নারায়ণ রচিত সাহিত্যের নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না বলে তাঁর কৃতিত্ব ও রচনার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎকালীন অহোমরাজাকে লেখা তাঁর পত্রের যে নমুনা পাওয়া যায় তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা গদ্যে লেখা এই পত্রটি বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন ঃ "লেখনং, কার্যঞ্চ, এথা আমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চা (বঞ্ছা) করি। এখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভায়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে যে বর্দ্ধিতাক

পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমার সেই উদ্যোগতে আছে।" মহারাজা নর নারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রবর্তক 'শ্রী চৈতন্যদেব' একবার কামরূপে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

নর নারায়ণের পরবর্তী মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও বীর নারায়ণের শাসনকালে রাজ্যে ব্যাপক শিক্ষার বীজ উপ্ত হয়েছিল কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল রুক্ষ উষরতা। রাজসভার পূর্বের সে ঔজ্জ্বল্য ছিল না, রাজারাও ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্য সৃজনে আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবত উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ ও পারিবারিক গোলযোগ ও উত্তরাধিকার রক্ষার অবিরাম প্রয়াস জনিত কারণে এই রাজাগণ সাহিত্য সাধনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তী রাজা প্রাণ নারায়ণের সাহিত্য প্রীতি সুবিদিত। তিনি সংস্কৃত ও ব্যকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা বীর নারায়ণ রাজ্যে শিক্ষার যে বীজ বপন করেছিলেন, মহারাজা প্রাণ নারায়ণের যত্নে তা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশ ডালপালায় সুশোভিত মহীরুহে পরিণত হয়ে সুফল প্রদান করেছিল। তাঁর রাজসভা সর্ব্বদা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সজ্জিত থাকত। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ও সভাসদগণ সকলেই সংস্কৃত ভাষী ছিলেন এবং তাঁর একটি 'পঞ্চরত্ন' পণ্ডিত সভা ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজা প্রাণ নারায়ণের আদেশে কবিরত্ন 'রাজখণ্ডম' নামে এক খণ্ড ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। মহারাজা প্রাণ নারায়ণের আদেশে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর কাব্য রচনা করেছেন। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'বিশ্বসিংহচরিতম' কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শ্রীনাথ আদিপর্ব, দ্রোণপর্ব এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর রচনা করেছিলেন। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহারাজা প্রাণ নারায়ণ সম্পর্কে লিখেছেন,

" মহারাজ কাব্য সঙ্গীতের দীক্ষাগুরু।
দরিদ্র জনার জাঞ বাঞ্ছা কল্পতরু॥"
(আদি পর্ব ৫২ পত্র)

সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় সমকালীন কামতার সামাজিক রীতি নীতি শিষ্ঠাচার ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। মহারাজা প্রাণ নারায়ণের সময় দ্বিজ রামেশ্বর 'মহাভারতের পদ' এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রহ্লাদচরিত' রচনা করেছিলেন। বিশরদ কবি মহাভারতের 'বিরাটপর্ব্ব' এবং 'কর্ণপর্ব্ব' রচনা করেছিলেন। মহারাজা প্রাণ নারায়ণ সংস্কৃত ভাষার ব্যকরণ ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কবিতা রচনায় এবং গীতবাদ্যেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে তদানীন্তন মানব সমাজ রাগ, রাগিনী এবং তালমান সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞানলাভ করত। কিন্তু সেই সব গ্রন্থগুলি পুড়ে যাওয়াতে বর্তমানে তাদের চিহ্নমাত্রও নাই। মহারাজা প্রাণ নারায়ণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র 'প্রাণাভরণম্' কাব্য রচনা করেন। জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহারাজা প্রাণ নারায়ণের আদেশে 'প্রয়োগরত্নমালা' ও ব্যকরণের 'প্রভা প্রকাশিকা' টীকা রচনা করেছিলেন। জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উক্ত টীকার মুখবন্ধে লিখেছেন,

'যস্মিন্নীতিমতাং বরেহতি বিপুলাং ধর্ম্মের্দ্ধরাং শাসতি
শ্রী রামে ধরনীপতাব পিনৃনাং কিন্নাভবদ্বিস্মৃতিঃ।
শ্রী গোবিন্দপদারবিন্দ বিগনব্বু লীকণোদ্বর্ত্ত নৈঃ
শুদ্ধাঙ্গঃ সমহীভৃদস্তু বিজয়ী শ্রী প্রাণনারায়ণ।' ৩

মধুপুরের বনমালী গোঁসাই মহারাজা প্রাণ নারায়ণের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। মহারাজা প্রাণ নারায়ণ বনমালী গোঁসাইকে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে গঙ্গাতীরে ' তুলাপুরুষ ' দান করেছিলেন।

' যার তুলাপুরুষ দানত পায়া ধন।
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোনার কঙ্কন।। '
(শ্রীনাথ অনুবাদিত/দ্রোণপর্ব্ব/১মপত্র)

"মহারাজা প্রাণ নারায়ণ শ্রী শিরোমণি ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণকে কিছু জমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করেছিলেন। উক্ত জমির দানপত্রও সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল।" [২৮] মহারাজা প্রাণ নারায়ণ 'কামতেশ্বরী দেবীর' সেবা পূজার জন্য বহু সম্পত্তি দান করে গেছেন। 'কামতেশ্বরী দেবীর' মন্দিরের দ্বারলিপিতে লেখা আছে ; -

' ওঁ নমঃ শ্রী গণেশায়
সম্মত্যা দ্বিষদেকজিত্বর ভূজাদণ্ড প্রতাপর্য্যম —
ক্রীড়া কন্দুক বেগ বর্দ্ধিত দিশঃ শ্রীপ্রাণভূমি পতেঃ।
শকাবেদ নগনাগ মার্গনহিমজ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ
শ্রী ভাজা কবি মণ্ডলেন ভজতা ভব্যো ভবানী মঠঃ।'

১৮৫৭

মহারাজা প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরেও রাজসভার ভিতরে ও বাইরে রাজ্যের সর্বত্র সাহিত্য সাধনার ধারা মোটামুটি অব্যাহত ছিল। শিল্প সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। রূপ নারায়ণের রাজত্বকালে আসাম রাজ রুদ্রসিংহ 'ঘনশ্যাম' নামে কোচবিহারবাসী এক স্থপতিকে নিজ রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আসামের অন্তর্গত রঙ্পুর, শিবসাগর ও চড়াইদেও প্রভৃতি নগরে অনেকগুলি সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কামতা নগরের অধিবাসী 'শ্রীনাথ' ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বিরাট পর্ব্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

বস্তুত পক্ষে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে এসেই আমরা রাজপরিবারে প্রথম ব্যাপক সাহিত্য রচনার ইচ্ছা লক্ষ করি। এ সময়-ই রাজপরিবারের সাহিত্যচর্চা নূতন মাত্রা লাভ করে।

কোচবিহারের সাহিত্য ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। তাঁর রাজত্বকাল বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যদিও তিনি ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগের বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংকট ও নবজাগরণের অন্যতম স্রষ্টা তবুও তাঁর মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির পরিবর্তে ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি কবি সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং নিজের সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, তাঁর সাহিত্য কৃতি ও তাঁর কালের যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। "মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ শ্যামাসংগীত-ই বহুল পরিমাণে রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি ভক্তিরসমূলক সংগীতও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সংগীতগুলি থেকেই অনুমান করা যায় হরেন্দ্র নারায়ণের রচিত 'গীতাবলি' বাংলা সাহিত্যের দরবারে কত মূল্যবান। বঙ্গগীতি শাখার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাসে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ।" [২৯] ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত জোর দিয়ে বলেছেন, "The Ruling House of Cooch Behar deserves respectful mention in the history of Bengali literature for the valuable contribution of the Rulers both as authors themselves and as patrons to a large number of Great and small poets. This effort of the Ruling House of Cooch Behar for countries was, therefore, not inspired merely by a literary motive ; it was also something like a cultural mission of which Cooch Behar may well fell proud and for which all Bengal should remain greateful to the Rulling House." [৩০] মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের বাংলা, পার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। জয়নাথ মুন্সী তাঁর 'রাজোপাখ্যানে' লিখেছেন, "শ্রী শ্রী মহারাজ ভূপবাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর হইয়াই পার্শীতে বাঙ্গালাতে স্বচ্ছন্দ আর খোসখৎ অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন, বরং পার্শীতে এমন খোসনবীস লেখক সন্নিকট নাহি। (১ম খণ্ড/অষ্টম অধ্যায়)।" বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজের হাঁতে যখন রাজ্যভার গ্রহণ করলেন তখন তাঁর রাজসভায়, "যে সকল লোক ... হুজুরে যাইত, নানা শাস্ত্র নানা পুরাণের ধর্ম্ম প্রসঙ্গ আলাপ হয়। ...আর ভূপতির তখন হইতে কবিতা শক্তি। সংস্কৃত পুস্তক সকল ভাঙ্গিয়া ভাষাপদ করিতেন।" [৩১] (প্রত্যক্ষ খণ্ড। ত্রয়োদশ অধ্যায়)।

"হরেন্দ্র নারায়ণ নিজে অনুবাদ করেছিলেন রামায়ণের সুন্দর কাণ্ড। (১৩৩৯ সালে তা অংশত প্রকাশিত); মহাভারতের ঐষিক পর্ব; সভাপর্ব; শল্য পর্ব; শান্তি পর্ব; স্কন্দ পুরাণ (ব্রহ্মোত্তর খণ্ড); ক্রিয়াযোগসার; পদ্মপুরাণ (রিপুঞ্জয় ও রঘুরামের সহযোগ রচিত), বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (মধ্য খণ্ড ও উত্তর খণ্ড); উপকথা (দুই খণ্ড/কোচবিহার সাহিত্য সভা কর্তৃক ১৩৩৪ ও ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত, এক মৌলিক রচনা বলা যায়); রাজপুত্র উপাখ্যান; প্রেত উপাখ্যান প্রভৃতি। এছাড়া তিনি রচনা করেছিলেন বহুসংখ্যক সাক্ত গীতি (সাহিত্য সভা কর্তৃক 'গীতাবলী' নামে শরচচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় প্রকাশিত)।" [৩২] সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'ক্রিয়াযোগসার' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক শরচচন্দ্র ঘোষাল বলেছেন, "রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ প্রভৃতির মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ প্রচার করা মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের একান্ত কামনা ছিল। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ নিজে এবং মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আজ্ঞায় যে সকল পণ্ডিত রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা অবিকল মূলের অনুযায়ী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।" এই একই সম্পাদক অন্যত্র উক্ত রাজার রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড) অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, "মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ মূল অনুসরণ করিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু অনেক স্থলে মূলের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় অনুবাদ অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। ... মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ... অনেক স্থলে মূলর অনুসরণ না করিয়া কৃত্তিবাসের অনুসরণ করিয়াছেন... মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের বিশেষত্ব এই যে ইহা যতদূর সম্ভব সর্গে সর্গে মূল অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছে।" (সুন্দর কাণ্ড রামায়ণ/ভূমিকা/৫ম খণ্ড।) বস্তুত মূলানুগ অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন এবং তাতে হরেন্দ্র নারায়ণ সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তাঁর কৃতিত্ব ম্লান হয়নি বরঞ্চ বলা যায় যে মূলানুগ অনুবাদের ক্ষেত্রে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন।

' ক্রিয়াযোগসাগর ' গ্রন্থখানি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ একা সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নি। তিনি এবং তাঁর সভাস্থ পণ্ডিতগণ মিলিতভাবে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। 'উপকথা' পদ্যে রচিত গল্পের বই, 'রাজপুত্র উপাখ্যান'ও পদ্যে রচিত একটি রাজপুত্রের কাহিনী, নানা প্রকার ছন্দে গ্রথিতা সম্ভবতঃ সংস্কৃত দশকুমার চরিতের কাহিনী থেকে এর আখ্যানাংশ গৃহীত। তাঁর লেখা 'উত্তর কাণ্ড' রামায়ণের দুটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুঁথি দুটির বিষয় এক হলেও বিভিন্ন স্থানে বর্ণনার নানা অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। অনুমিত হয়, সম্পূর্ণ কাণ্ডটি মহারাজা এক-ই সময়ে অনুবাদ করেন নি। মহাভারতের ঐষিক পর্ব, শল্যপর্ব প্রভৃতি মহারাজা একা অনুবাদ করলেও সভাপর্বের অনুবাদে অনুবাদক হিসাবে তাঁর সঙ্গে 'জয়দেব' ও 'দ্বিজ ব্রজসুন্দরের' নামও পাওয়া যায়। জয়দেব ও দ্বিজ ব্রজসুন্দরের রচনাংশ থেকে জানা যায় যে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হরেন্দ্র নারায়ণের সভাসদ কবি ব্রজসুন্দর সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। ঐ পুস্তকে মহারাজার কালীপূজার নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে ঃ-

কিবাপুরী নির্ম্মাইছে নৃপতি কেশরী।
বিরাজ তাহার মাঝে রাজরাজেশ্বরী ॥
বিনীত তনয় দেখি স্নেহ করি মনে।
শিবসনে ভগবতী আসিছে আপনে ॥
সিংহাসনে শিবের হৃদয় সরোবরে।
অমল কমল পদতল শোভাকরে ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান নিতম্ব বসনা।
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা শানিত দশনা ॥
তারার মন্দিরে উপহার দ্রব্যগন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কুসুম চন্দন ॥
সুধারস প্রায়স ব্যঞ্জন অন্নরাশি।
সুবর্ণ ভাজনে কত আছেন প্রকশি ॥
ধরাপতি তারিণী চরণ করি ধ্যান।
নিত্য হোম করে নিত্য দেয় বলিদান ॥
নিত্য নৃত্য গীত মহোৎসব পুরঃ সবে।
বিহার নৃপতি ভগবতী পূজা করে ॥

" বৃহদ্ধর্ম পুরাণ" ও "স্কন্দ পুরাণ" অনুবাদের ক্ষেত্রেও মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নীচে তাঁর রচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল ঃ-

১. " পূর্বে অতি অপূর্ব্ব জগত যে প্রকার।
সৃষ্টি করিয়াছ সৃষ্টি কর গুণাধার ॥
শেহিমত ত্রি জগত সৃষ্টি কর বিধি।
ব্রহ্মাক এমত বলি প্রভু কৃপানিধি ॥
শে পরমেশ্বর গদাধর শেহিক্ষণ।
হৈল অন্তধ্যান জ্ঞানগম্য সনাতন ॥"
(ক্রিয়াযোগসার/২য় অধ্যায়/পৃষ্ঠা ১৬)

২. " নিশাচর নিকর আবরি আছে ধরি।
জয় ইন্দ্রজিত বানি বলে হর্শ করি ॥
যে শুবোধ নিরোধ করিয়া চেষ্টাগণ।
সব প্রায় মহাকায় রহিল তখন ॥
নির্ব্বিকার দেহ তার দেখি রক্ষগণ।
হৃষ্টমতি হৈল অতি রাবন নন্দন ॥"
(রামায়ণ/সুন্দর কাণ্ড/৪৮ সার্গ/পৃষ্ঠা ৩৫)

৩. " অধ্যায়ের অবসানে সভাসদ জন।
বলরাম নাম সবে ভরিয়া বদন ॥
যেহি রাম সেই তারা সেই আদ্যাশক্তি।
একভাবে ভাবিলে মিলিবে ভক্তিমুক্তি ॥"
(বৃদ্ধর্ম পুরাণ)

৪. " হায় তার কি সমনের ভয় মা জার শ্যামা হয়
অতুল অপ্রাপ্য চরণ তার কি উপমা হয়,
কিবা দিবা বিভাবরি ঐনাম স্মরণ করি
অন্তরে বিরাজি আমার শ্যামা গুণধামা হয়
শ্রী হরেন্দ্র ভূপ কয় ভবে কিবা আছে ভয়
অন্তে জাব তারা ধামে বাজাইয়া দাস ॥"
(গীতাবলী/গীত নং ৯০/পৃঃ ৪৫,৪৬)

বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের অনুরাগ ছিল। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা করে গীতবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। জয়নাথ মুন্সী তাঁর রাজোপাখ্যান গ্রন্থখানিতে লিখেছেন, "গানবাদ্য সকলি শিক্ষা করিলেন এবং তাল মান ও রাগ রাগিনী এমন বুঝিতে লাগিলেন যে, উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশঙ্কিত হইয়া হুজুরে গান করেন।"

বাস্তবিক-ই মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে মৌলিক সাহিত্য তেমন রচিত না হলেও হরেন্দ্র নারায়ণ নিজের এবং তাঁর আশ্রিত ও অনুগ্রহ পুষ্ট পণ্ডিতগণের একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনা কোচবিহার রাজ্যকে নবজাগরণের সিংহ দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ কাশীতে গিয়েছিলেন ও ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কাশীবাসীকে সম্বোধন করে তিনি গেয়েছেন ঃ-

" আমায় সদয় হৈয়া গমন কর কাশীবাশী
তোমার দর্শনে ক্ষয় হইল আমার পাপরাশী।" [৩৩]

আবার কাশীযাত্রা বিষয়ে হরেন্দ্র নারায়ণ গেয়েছেন,

" চলমন কাশী হও অবিরত কাশীবাশী
কাশী মহশ্মশান জথা ইশান বিরাজমান সর্ব্বদা।
অন্নপূর্ণারূপে জথা ইশান বিরাজেন মুক্ষদা
চল এমন ধামে মনরে আমার মুক্তি কামে পাবে কীর্ত্তী অবিনাশী।" [৩৪]

হরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণও কবি ছিলেন। পিতার মত তিনিও সংগীত রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত "আগমনী" গানের উল্লেখ নিম্নে করা হ'ল ঃ-

" গিরিপুরে কি আনন্দ হৈল আমার উমানিধি গৃহে আইল ঃ
আমি চিরদিনের দুখি হে রাজ ঃ
ওচান্দ বদন হেয়্যা প্রাণ জুড়াইল ঃ।
কহে শ্রী শিবেন্দ্র ভূপে
আমার মনের আন্ধার দুরে গেল।"

সম্ভবত স্বল্পায়ু ছিলেন বলে শিবেন্দ্র নারায়ণ সাহিত্য চর্চায় তেমন মনোনিবেশ করতে পারেনি। অবশ্য শিবেন্দ্র নারায়ণের সাহিত্যকৃতির নূন্যতা কিছু পরিমাণে পুষিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অন্যতমা মহিষী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী।

মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী (বড় আই) ছিলেন যথার্থই বিদুষী। তাঁর-ই আন্তরিক প্রচেষ্টায় গত শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কোচ অন্তঃপুরে একটি সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। মহারাজা নর নারায়ণের মহিষী ভানুমতীর তিনি ছিলেন প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। অন্তঃপুরে নারীদের মধ্যে সেই সময় তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত ও রুচিশীল। তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থাদি। কোচবিহার রাজান্তপুরে তিনিই ছিলেন প্রথম সফল মহিলা সাহিত্যিক। তিনি 'বেহারোদন্ত' নামক পদ্যে কোচবিহারের একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। 'বেহারোদন্ত' কথাটির অর্থ বেহার বা কোচবিহারের ঐতিহাসিক বিবরণ। ১২৬৬ সনে রংপুরের কাকিনায় গ্রন্থটি ছাপা হয়। তবে পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ভণিতা অনুসারে 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে বলার নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে, ভণিতাটি নিম্নরূপ ঃ-

" অষ্টাদশ শতে কাশী শকের নির্ণয়।
মৃগেন্দ্রের পক্ষ দিনে লিপি সাঙ্গ হয়।।"
(বেহারোদন্ত/পৃষ্ঠা ৯৮)

উক্ত গ্রন্থটিতে সমসাময়িক বিবরণ বেশী স্থান পেয়েছে। সমকাল পর্যন্ত রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ যেমন এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তেমনিই মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর আগে ও পরে তাঁর রাজসভার বিবরণও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি গ্রন্থের সূচনায় বন্দনা অংশে বলেছেন,

" সর্বক্ষণ এই চিন্তা হতেছে আমার।
বেহার বৃত্তান্ত কিছু করিতে প্রচার ॥

খর্ব কলেবর মনে চন্দ্রমা ধারণ।
যে পঙ্গু ইচ্ছে গিরি করিতে লঙ্ঘন ॥"
(বেহারোদস্ত/পৃঃ ২)

প্রজাপালনকারী রাজমহিষীর বিনয় এখানে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থটির দু-এক স্থানে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকলেও পয়ার ত্রিপদী ছন্দের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উপমা প্রয়োগে গ্রন্থটি যেমন একদিকে বিশেষ স্থান লাভ করেছে আবার সমসাময়িক দেশ ও সমাজের সত্যিকারের রূপটি তুলে ধরায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও অসীম। যেমন তিনি লিখেছেন ঃ

১. "সচিব যাঁহারা, দ্বন্দে মত্ত তাঁরা,
রাজ্য দিকে নাহি চায়।
প্রজার সর্বস্ব হরে সব দস্যু,
বিচার কে করে তায়।"
(বেহারোদস্ত/পৃঃ ৩৫)

ঐতিহাসিকরূপে মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাঁর সমকালে এমন কৃতিত্বের দাবিদার আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিবেন্দ্র নারায়ণের বড় রাণী কামেশ্বরী দেবী নিজে সাহিত্যিক না হয়েও সর্বদাই সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর-ই অনুগ্রহে কোচবিহার রাজ্যের অনেক কবি, সাহিত্যিক মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য রচনার দ্বারা কোচবিহারের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি, মহারাণী কামেশ্বরী দেবীর আদেশে, "কোচবিহারের অন্তর্গত গোবরাছড়া গ্রাম নিবাসী রিপুঞ্জয় দাস এবং বিদ্যারত্ন উপাধিধারী এক পণ্ডিত কর্ত্তৃক, "মহারাজবংশাবলী" বাংলা গদ্যে বিরচিত। উহা শিবেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের) পরে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে রাজবংশের ইতিহাস অতিসংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।"

মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কোচবিহার থেকে কু-প্রথাগুলিকে দূরীভূত করে রাজ্যটিকে আধুনিক করে তুলবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সংগীত ও চিত্রবিদ্যা চর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে পণ্ডিতব্যক্তিগণ বিশেষ সমাদর পেতেন।

এইভাবেই কোচবিহারের রাজবংশ ঐতিহ্য পরম্পরা এই রাজ্যকে সুসংস্কৃত ও সুশিক্ষিত করে পা বাড়িয়েছে আধুনিকতার পথে। সমস্ত দিক থেকে এই উন্নতি শীর্ষদেশে পৌঁছেছে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে (১৮৬৪-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সাফল্যের মূলে তাঁর পারিবারিক এই ঐতিহ্য পরম্পরা অনেকটা সাহায্য করেছে — একথা বলা যেতে পারে।

---

সূত্র ঃ


১. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ৩০, ৩১
২. কোচবিহারের ইতিকথা/চঞ্চল রঞ্জন দাস। পৃঃ ২৪
৩. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ৩২
৪. তদেব পৃঃ ৪৬।
৫. কোচবিহারের ইতিকথা/চঞ্চল রঞ্জন দাস পৃঃ ৪৩, ৪৪
৬. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ৫৪
৭. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্র নাথ পাল পৃঃ ৮৬
৮. তদেব পৃঃ ৮৮, ৮৯
৯. বেহারোদস্ত/মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী।

১০. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়/সম্পাদনায় ড. নৃপেন্দ্র নাথ পাল পৃঃ ৯২
১১. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ লিখিত নিবন্ধ পৃঃ ১০৪, ১০৫
১২. তদেব পৃঃ ১০৭, ১০৮
১৩. তদেব পৃঃ ১০৯
১৪. তদেব পৃঃ ১১০
১৫. তদেব পৃঃ ১১২
১৬. Cooch Behar states and its Land Revenue settlement / H.N.Ray Chowdhury P- 121.
১৭. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলাসংখ্যা ১৩৯৬-৯৭, পৃঃ ১১৮
১৮. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১
১৯. Eastern India Vol III P-681.
২০. কোচবিহার দর্পণ (৯ম বর্ষ/একাদশ সংখ্যা) ফাল্গুন ১৩৫৩
২১. বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ/৩য় সংখ্যা/১৩৮৫) পৃঃ ৪৫৯
২২. The Sikh Religion - Mochanliff Vol I P - 73.
২৩. শ্রীমদ্ভাগবত/শ্রী হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া সাহিত্য রত্ন সম্পাদিত পৃঃ ৪৩৬
২৪. তদেব পৃঃ ৫৫
২৫. তদেব পৃঃ ১৪, ১৫
২৬. আসাম সাহিত্যসভার ৯ম অধিবেশন সভাপতির ভাষণ পৃঃ ৫০
২৭. The Work of the Kamarupa Anusandhan Samity 1920, P-87.
২৮. কোচবিহারের ইতিহাস/আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ১৬৪
২৯. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) সম্পাদকের নিবেদন অংশ
৩০. A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts (1948) P III.
৩১. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) সম্পাদকের নিবেদন অংশ পৃঃ ১১০
৩২. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ পৃঃ ২৪৯
৩৩. মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), সম্পাদকের নিবেদন অংশ পৃঃ ১৯০
৩৪. তদেব পৃঃ ১১০